বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের কিছু কাজের নমুনা

বঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তার ১৮৯৬-৯৭ সালের রিপোর্টে আছে, খেয়ারা জেলার স্থানীয় অফিসাররা দলিত ছেলেদের স্কুলে ভর্তির চেষ্টা করলে এখানকার পাঁচ ছয়টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটি গ্রামের নীচু জাতিদের কুড়ে ঘর ও ফসল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ছেলেদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করার অপরাধে গ্রাম্য সমাজ শাস্তি হিসাবে দলিতদের থেকে কর আদায় করে দু'বছর ভরে। এই অবস্থায় গ্রামে গোঁড়া হিন্দুদের হাতে দলিতদের শিক্ষার ভার দেওয়ার অর্থ—দলিতদের শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া। আম্বেদকর বহিষ্কৃত হিতকারিনী সভার পক্ষ থেকে দলিত অস্পৃশ্যদের শিক্ষার জন্য নিম্নের দাবীগুলি পেশ করেন ঃ

(১) প্রাথমিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনে গ্রামের স্থানীয় সংস্থার উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা বাতিল করে গ্রাম্য সংস্থার হাত থেকে শিক্ষার দায়িত্ব সরিয়ে দিতে হবে। কারণ, গ্রাম্য সমাজ দলিত শ্রেণিকে শিক্ষিত করার সম্পূর্ণ বিরোধী।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা নিশ্চিন্ত করতে হবে। অন্যথায় দলিত শ্রেণীর ছেলেরা শিক্ষা পাবে না।

(৩) হাণ্টার কমিশন মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ সুপারিশগুলি করেছে সেইসব ব্যবস্থা দলিতদের শিক্ষার জন্যও গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এই পিছিয়ে পড়া জাতি এগুতে পারবে না।

(৪) শিক্ষিত দলিত শ্রেণীর ছেলেদের চাকরির নিশ্চয়তা দিতে হবে। এতে পড়াশুনায় এদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

১৯৪২ সালে ১৮ ও ১৯ জুলাই আম্বেদকর নাগপুর সারা ভারত দলিত শ্রেণি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় নাগপুরে তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে সদস্য হিসাবে নিয়োগের আদেশ পত্রটি পান। ২০ শে জুলাই নাগপুর থেকে এই সদস্যপত্র গ্রহণের সম্মতি। তিনি তার যোগে জানিয়ে দেন এবং আগষ্ট মাসে দিল্লীতে শাসন পরিষদে শ্রম সদস্য হিসাবে কাজ শুরু করেন। বড়লাটের শাসন পরিষদে শ্রমসদস্যের কার্যকালে তিনি শ্রমিকদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তার পূর্বে শ্রমিকদের জন্য এত ব্যাপক ও কার্যকরী

ব্যবস্থার কথা কেউ ভাবেননি। তাঁর প্রবর্তিত অনেক ব্যবস্থা এখনও শ্রমিক কল্যানের ক্ষেত্রে আদর্শ বলে গণ্য হয়। ব্যবস্থাগুলি সংক্ষিপ্তাকারে নীচে দেওয়া হল ঃ

(১) ত্রিদলীয় বৈঠকের বন্দোবস্ত ঃ শিল্পোদ্যোগী ও ব্যবসায় মালিক, মজুর ও সরকার—এই তিন পক্ষ একসঙ্গে বসে কাজের নীতি ও মালিক মজুর সম্পর্ক ঠিক করবে। এই ব্যবস্থা তিনি প্রথম স্থায়ীভাবে প্রবর্তন করেন। এতে দেশের শ্রমিক সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হয়। শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

(২) শ্রম প্রশাসন ঃ মালিক ও মজুরের বিবাদ বন্ধ করতে ও মিটিয়ে দিতে, শ্রমনীতির ও শ্রমকল্যাণ ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ন করতে তিনি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন প্রধান শ্রমাধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করেন। শ্রমাধ্যক্ষ তার কর্মচারীদের সহায়তায় সব সময় শিল্পে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ও উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

(৩) কর্ম-সংস্থান ঃ দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তাদের সুবিধামত নিজেদের কর্মচারী ও কর্মী নিয়োগ করত। এজন্য একই গোষ্ঠির লোক বা নিয়োগকারীদের আত্মীয় স্বজনরা এইরূপে সংস্থায় ও প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ বেশি পেত। আম্বেদকর দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করেন। চাকরী প্রার্থীরা এইসব কেন্দ্রে তাদের নাম, ঠিকানা ও যোগ্যতার বিবরণ রেখে দেবে। নিয়ম করা হল, কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নথিভুক্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকে চাকরী দানকারী প্রতিষ্ঠান চাকরির জন্য উপযুক্ত প্রার্থী বেছে নেবে। এতে চাকরির সুবিধা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল।

(৪) সামাজিক নিরাপত্তা ঃ কাজের বিপদ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠনের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ আইন পাশ করান। এতে কর্মীর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারকে এবং দুর্ঘটনায় আহত ও পঙ্গুকে এককালীন অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) নিম্নতম বেতন ক্রম ঃ শ্রমিকদের জন্য একটা নিম্নতম বেতনের হার চালু করার নীতি গৃহীত হয়। অর্থাৎ স্থিরীকৃত নিম্নতম বেতনের চেয়ে কম বেতন কোন শ্রমিককে দেওয়া যাবে না। এই নীতির অনুসরণে তিনি ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নিম্নতম বেতনক্রম বিল উত্থাপন করেন। এই বিল পাশ হওয়ার পর শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন তালিকাভুক্ত শিল্পে নিম্নতম বেতনের হার প্রবর্তিত হয়। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে এই বেতনের হার যাতে যথোচিতভাবে সংশোধিত হয়—তারও ব্যবস্থা করেন।

(৬) কাজের সময়সীমা ও সবেতন ছুটি ঃ আইন করে শিল্প ও কল

কারখানায় শ্রমিকদের কাজের সময় হ্রাস করেন। সপ্তাহে ৬৪ ঘণ্টা ও দিনে ১০ ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা ও দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় ঠিক করে দেন। এই আইনেই প্রথম অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য দ্বিগুন হারে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক কর্মীদের জন্য বছরে ১০ দিন ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক কর্মীদের জন্য বছরে ১৪ দিন সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করেন।

(৭) শ্রমিক সমিতি ও শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা ঃ তিনি অফিসে কারখানায় ও শিল্পে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সমিতিকে **(Trade Union)** স্বীকৃতি দেবার উদ্যোগ নেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতীয় শ্রমিক সমিতি (সংশোধনী) বিল পাশ হয় ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এর ফলে ভারতবর্ষে প্রথম শিল্প শ্রমিকদের সমিতি স্বীকৃতি পায়। এই সমিতি শ্রমিক শ্রেণীর উপর মালিকের যথেচ্ছ অন্যায় ও অবিচার বন্ধ করতে অনেকাংশে সফল হয়েছে।

(৮) শ্রমিক কল্যান ঃ কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে শ্রম সদস্য থাকা কলে তিনি শ্রমিক শ্রেণির বেতন, খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিশেষভাবে পরীক্ষা করার জন্য শ্রমিক অনুসন্ধান সমিতি গঠন করেন। ১৯৪৪ সালে আইন পাশ করিয়ে তিনি কয়লা ও কোক-কয়লার উপর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এই অর্থ থেকে কয়লা খনি শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক কল্যাণ তহবিল সৃষ্টি করেন। এই তহবিলের অর্থ দিয়ে কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্য জল সরবরাহ, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা, শিক্ষা, খেলাধুলা, অবসর বিনোদন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা করেন। এইভাবে অভ্র, তামা ও স্বর্ণখনির মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের জন্য, পৃথক শৌচাগার ও স্নানাগার তৈরী করেন। কর্মরতা মহিলাদের শিশু সন্তানের জন্য তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করেন।

নারীদের কল্যানার্থে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করান ১৯৪৩ সালে এরফলে গর্ভবতী মহিলা কর্মীদের জন্য ১৬ সপ্তাহ ছুটির ব্যবস্থা হয়। গর্ভবতী অবস্থায় দশ সপ্তাহ ও সন্তান প্রসবের পর ছয় সপ্তাহ।

সরকারী চাকরিতে, নিম্ন মধ্যবিত্তদের নিয়োগের জন্যও তিনি বহু চেষ্টা করেছেন। ভারতে রাজত্ব স্থাপনের প্রথম যুগে অন্যান্য জাতির সঙ্গে দলিত জাতির প্রচুর সহায়তা ইংরাজরা গ্রহণ করেছে। এই সময়ে ইংরাজদের পক্ষে যুদ্ধ করে বহু দলিত প্রাণ দিয়েছে। ভারতে শাসন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, ইংরাজ শাসক দেশীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে শ্রেণী বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। উঁচু জাতির কর্মীরা অস্পৃশ্য জাতির সঙ্গে একই বিভাগে কাজ করতে আপত্তি করে।

এতে পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য সরকারী বিভাগে দলিত শ্রেণির নিয়োগ বন্ধ করা হয়। এইভাবে দলিত গরিব ও সামাজিকভাবে হেয় শ্রেণীর লোকেরা জীবিকার ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়ে। সামাজিক সমতা অর্জনের চেষ্টায়ও তারা পিছিয়ে পড়তে থাকে। প্রথমে আম্বেদকর, বম্বের আইনসভায় এবং প্রশাসনের উচ্চস্তরে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান দাবি করেন। সাইমন কমিশনের কাছে পরে গোল টেবিল বৈঠকে শাসন সংস্কার প্রস্তাবকে কার্যকরী করলে—

(১) দলিত শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি হবে।

(২) নীচু জাতিরা চেষ্টা করে কাজের যোগ্যতা অর্জন করবে এবং

(৩) সর্বোপরি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা উঁচু শ্রেণির একচেটিয়া প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে দেশে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।

গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিরা ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রের কাঠামো বিষয়ে একমত হতে পারেননি। সেজন্য বৈঠকের সভাপতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব দেন যে তিনি মধ্যস্থ, হিসাবে নতুন শাসন-কাঠামোর বিতর্কিত অংশটি স্থির করবেন এবং এতে সংশ্লিষ্ট কমিটির সব সদস্য সম্মত কিনা জানতে চান। এই ব্যবস্থা না নিলে আলোচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া ছাড়া পথ নেই। অন্য অনেক প্রতিনিধির সঙ্গে গান্ধী লিখিতভাবে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নতুন শাসন ব্যবস্থা ঘোষিত হওয়ার পরই তিনি এর প্রবল বিরোধিতা শুরু করেন। ঘোষণার একটি বিশেষ অংশ গান্ধী বাদ দিতে চান। তা হল—দলিত অস্পৃশ্যদের স্বাধীন ভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারটি।

দলিতদের এই অধিকার সাময়িকভাবে দেওয়া হলেও গান্ধী এতে রাজী নন। কারণ তিনি চান, অস্পৃশ্যরা কখনও স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পাবে না। দলিতদের প্রতিনিধি হিসাবে আম্বেদকর রাজী হলে তবেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ব্যবস্থায় পরিবর্তন সম্ভব, অন্যথায় নয়। স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের এই অধিকার, অন্তত প্রথম কয়েকটি নির্বাচনে দলিতদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য আম্বেদকর দলিতদের এই অধিকার ছাড়তে রাজী নন। উপায়ন্তর না দেখে গান্ধী ঘোষণা করলেন যে প্রস্তাবিত ভারত শাসন ব্যবস্থায় দলিতদের আলাদা ভোটের অধিকার তুলে না দিলে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ থেকে তাঁর এই অনশন শুরু হয়।

গান্ধীর আমরণ অনশনে সারা দেশের ও বিশ্বের দৃষ্টি আম্বেদকরের উপর পড়ল। একমাত্র তিনিই দলিতদের আলাদা ভোটের অধিকার তুলে দিতে রাজী হয়ে গান্ধীর জীবন বাঁচাতে পারেন। অনেক চিঠি ও টেলিগ্রাম আসতে থাকে আম্বেদকরের কাছে। বিশিষ্ট কংগ্রেস ও জাতীয় নেতারা বারবার আম্বেদকরের সঙ্গে

আলোচনা করেন। সভা ডেকে কয়েকবার আম্বেদকরকে অনুরোধ করা হয় দলিতদের স্বাধীন ভোটাধিকারের দাবি তুলে নিতে। এই সময় আম্বেদকরের জীবননাশেরও হুমকি আসতে থাকে।

আম্বেদকর দলিতদের ভোটাধিকারের ন্যায্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সকলকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলেন। তিনি আরও বলেন যে গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকে দলিত অস্পৃশ্যদের সমস্যাকে মামুলী বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই এই বিষয় নিয়ে এই চরম প্রতিবাদ তার শোভা পায় না। বক্তব্যকে বাড়িয়ে আম্বেদকর বলেন, "মহাত্মারা অমর নন। জগতে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা বাণী ছড়িয়েছেন, শিষ্যবৃন্দ নিয়ে রাস্তায় ধুলার ঝড় তুলেছেন, কিন্তু দলিতদের উপরে তোলেননি। দলিতরা অনেক চেষ্টায় মানুষের মত বাঁচার, সমাজের উপরে ওঠার একটু সুযোগ পেয়েছে। কারো জীবনের জন্য তারা এই সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়।" তার কথা শুনে কংগ্রেসের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনশনে গান্ধী দুর্বল, তখন অন্যান্য বড় নেতাদের সঙ্গে আম্বেদকর যারবেদা জেলে যান, গান্ধীকে দেখতে। সমস্যার সমাধান সূত্রও খুঁজতে চান সেখানে।

অনেক আলোচনার পরেও মনোমত সূত্র পাওয়া যায় না। এর কারণ স্বাধীনভাবে আলাদা ভোটদানের অধিকার দলিতদের জন্য খুব মূল্যবান। এই অধিকার ত্যাগ করা দলিতদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এদিকে অনশনক্লিষ্ট গান্ধীর শারীরিক অবনতি হচ্ছে। আম্বেদকর বলেন যে জীবনে তিনি এত বড় সঙ্কটে কখনও পড়েন নি। একদিকে তাঁর দলিত অস্পৃশ্য ভাইদের স্বাধীনতা ও কল্যাণ অন্যদিকে মানবতার খাতিরে গান্ধীর জীবন রক্ষা। কংগ্রেস অনুরাগী মস্তানরা তাঁর জীবন নাশ করতে চাইলেও তিনি দলিতদের আলাদা ভোটাধিকার ত্যাগ করতে রাজী হননি। এখন গান্ধীর জীবন বাঁচাতে তিনি দলিতদের আলাদা ভোটের অধিকার ছাড়তে রাজী হলেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৩২) বিকাল ৫ টায় চুক্তি সই হয়। এর ভিত্তিতে গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন। চুক্তিতে দলিতদের পক্ষ থেকে সই করেন—আম্বেদকর, শ্রীনিবাসন, এম সি রাজা, রাজভোজ, রসিকলাল বিশ্বাস প্রভৃতি দলিত নেতারা। অন্য দিক থেকে সই করেন—মদনমোহন মালব্য, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজা গোপলাচারী, জি. ডি. বিড়লা, সাপ্রু জয়াকার, দেবদাস গান্ধী, মেটা প্রভৃতি হিন্দু উঁচু জাতির প্রতিনিধিরা। পুনে চুক্তি নামে পরিচিত এই চুক্তি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। পুনে চুক্তির শর্তগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রদেশগুলির আইনসভাতে দলিত শ্রেণির জন্য ১৪৮টি আসন সংরক্ষিত করা হবে। এই সংরক্ষিত আসনগুলিতে সদস্য নির্বাচনে হিন্দু উঁচুজাতির ভোটদাতারা ও দলিত শ্রেণীর ভোটদাতারা উভয়েই ভোট দেবে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় দলিতদের জন্য ৭৮টি আসন প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে সংরক্ষিত ছিল। এতে দলিত প্রতিনিধিরা শুধু দলিত শ্রেণীর ভোটদাতাদের ভোটে নির্বাচিত হত। অন্য, সাধারণ আসনগুলিতে সদস্য পদের জন্য উঁচু নীচু সব হিন্দুরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নির্বাচনে ভোট দিতে পারত।

(২) দলিতদের জন্য সংরক্ষিত ১৪৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলিতদের মধ্যে একটা প্রাথমিক নির্বাচন হবে। এই প্রাথমিক নির্বাচনে দলিতরা নিজেদের ভোটে প্রত্যেকটি সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রাথমিক নির্বাচনে যে চারজন দলিত প্রার্থী বেশি ভোট পাবে, শুধু তারাই পরে এই সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, উঁচুজাতি ও দলিত ভোট দাতাদের যৌথ ভোটদানের মাধ্যমে।

(৩) কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংরক্ষিত আসনে দলিত শ্রেণির প্রতিনিধিরা প্রাথমিক নির্বাচন ও পরে যৌথ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। উপরের ২ নং ধারাতে বর্ণিত নিয়ম এখানেও প্রযোজ্য হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় আইন সভায় দলিতদের জন্য সাধারণ আসনের ১৮ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করা হবে।

(৫) উপরোক্ত প্রাথমিক নির্বাচনের ব্যবস্থা দশ বছর চলবে, যদি না উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে দশ বছরের পূর্বেই এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়।

(৬) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় সংরক্ষনের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের যে অধিকার উপরের ২ নং ও ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে তা যতদিন না উভয় পক্ষ একমত হয়ে তুলে দেয় ততদিন চলবে।

(৭) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় ভোটদানের অধিকার লোথিয়ান কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে স্থির করা হবে।

(৮) স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচনের বা সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে দলিত শ্রেণীর লোকের উপর কোনও অক্ষমতা আরোপ করা যাবে না। দলিতরা ন্যায়ত স্থানীয় সংস্থায় যতগুলি সদস্যপদ ও সরকারে যতগুলি চাকরি পেতে পারে তা তাদের দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা চালাতে হবে। সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা অবশ্য দলিত প্রার্থীর জন্যও প্রযোজ্য হবে।

(৯) প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ থেকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দলিতদের শিক্ষার জন্য মঞ্জুর করা হবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ব শাসন দেওয়া হয়। প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য আম্বেদকর ১৯৩৬ সালে 'স্বাধীন শ্রমিক দল' গঠন করেন। ভূমিহীন কৃষক, গরীব বাড়ি বাড়াটে, সাধারণ চাষি ও মজুরদের দুঃখ কষ্ট দূর করা এই দলের কার্যসূচিতে স্থান পায়। আম্বেদকর ও তাঁর দল নতুন শাসন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু নতুন ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে নির্বাচনে যোগ দেন। স্বাধীন শ্রমিক দলের কার্যসূচী নীচে সংক্ষেপে দেওয়া হল ঃ

(১) লোক সংখ্যা বাড়ার জন্য জমির উপর চাপ বেড়েছে। জমি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় কৃষকরা জমির আয়ে সংসার চালাতে পারে না। কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য পুরান শিল্পগুলিকে বাড়ানো এবং নতুন শিল্প স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হবে।

(২) ব্যাপকভাবে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়ানো হবে। শিল্পকে দরকার মত সরকারি পরিচালনায় আনতে চেষ্টা করা হবে।

(৩) জমিদাররা বিভিন্ন কৌশলে চাষিদের চাষের জমি থেকে উৎখাত করে এবং চাষিদের থেকে টাকা আদায় করে। আইন করে চাষি উচ্ছেদ ও চাষিদের কাছ থেকে টাকা আদায় বন্ধ করা হবে। চাষি শ্রমিকদের জন্য কারখানা শ্রমিকদের মত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

(৪) শিল্প শ্রমিকের চাকরির স্থায়িত্ব, চাকরিতে উন্নতি, কাজের সময়কাল, উপযুক্ত বেতন, সবেতন ছুটি, ভাল বাসগৃহ প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে। বেকারি দূর করার জন্য নতুন বসতি স্থাপন করে উৎপাদনযোগ্য জমি বাড়ানো হবে। সরকারি জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও গ্রামোন্নতির কাজ বাড়ানো হবে।

(৫) নিম্ন মধ্যবিত্তদের সাহায্যের জন্য বড় শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলিতে বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

(৬) সমাজ সংস্কারকদের সাহায্য করা হবে। গোঁড়ামি ও প্রগতিবিরোধী শক্তি খর্ব করা হবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার করা হবে। গ্রামে গ্রামে পয়প্রণালী সংস্কারের ও গৃহনির্মানের কাজে হাত দেওয়া হবে।

(৭) গ্রামের লোকের ভাবনা-চিন্তায় নতুন যুগের ধ্যানধারনা আনার চেষ্টা হবে। গ্রামে হলঘর ও লাইব্রেরি স্থাপন করা হবে এবং চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা হবে।

তাঁর মতে নীচের বিষয়গুলিকে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করার প্রধান সমস্যা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে ঃ

(১) দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে অখণ্ড ভারতবর্ষের জাতীয় সনদ ও দায় দায়িত্বের সুষ্ঠু বণ্ঠন ব্যবস্থা।

(২) দু'টি দেশের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন অনুযায়ী লোক বিনিময়।

পাকিস্তানের সৃষ্টিতে হিন্দুদের লাভ ক্ষতি কি হতে পারে—তা তিনি সুচিন্তিত ভাবে পেশ করেছেন। এই বিষয়ে তার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

(১) বর্তমানে সাড়ে ছয় কোটির বেশি মুসলমান ব্রিটিশ ভারতে বাস করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে বৃটিশ ভারতে মুসলমান সংখ্যা কমে আসবে ২ কোটিতে। সাধারণ বুদ্ধিতে বলা যায় এর জন্য ভারতে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সংখ্যা ও ব্যাপকতা হ্রাস পাবে।

(২) কেন্দ্রিয় আইন পরিষদে ও আইন সভায় মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিষদে ও আইনসভায় মুসলমান সদস্য সংখ্যা পুরো সংখ্যার ৩৩ শতাংশ। শুধু হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করলে মুসলমান সদস্য সংখ্যা কেন্দ্রীয় পরিষদ ও আইন সভা—এই উভয় কক্ষেই হিন্দুদের চেয়ে বেশি। সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা। পাকিস্তান আলাদা হয়ে যে নতুন ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে—তার কেন্দ্রীয় পরিষদে ও আইন সভায় হিন্দু সদস্য সংখ্যা মুসলমান সদস্য সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে। এতে আইন প্রনয়ন, দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসন কার্যে ভারতীয়রা অনেক স্বস্তিতে কাজ করতে পারবে।

(৩) উপরোক্ত সম্ভাব্য লাভ ছাড়াও পাকিস্তান সৃষ্টিতে মুসলমানদের একটি মানসিক পরিবর্তনের আশা করা যেতে পারে। পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান প্রধান অঞ্চলের আন্দোলন অনেক সময় মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের মুসলমানদের নিজ রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির প্রবণতা কমবে। এতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা কমবে, আশা করা যায়।

তথ্য ঃ আমাদের আম্বেদকর ঃ দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস